মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৪

গবেষণার নতুন অধ্যায়
গণহত্যা বিষয়ক ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্স

গণহত্যা কখনো একটি জাতির জন্য সুখকর স্মৃতি নয়। পৃথিবীতে যে সকল জাতি গণহত্যার স্বীকার হয়েছে তাদের ঘুরে দাঁড়াতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এসকল গণহত্যাসহ পৃথিবীর আরো বিভিন্ন গণহত্যা কীভাবে সংঘঠিত হলো, কেন করা হলো এবং কারা করলো ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। আমরা সেই জাতি যারা গণহত্যার শিকার হয়ে, যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্ব অর্জন করে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। সেই সমৃদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণ এবং অধিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস কর্তৃক গত ৫ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ গণহত্যা ও ন্যায়বিচারের ওপর ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজিত হয়েছে। উক্ত কোর্সে বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ৯৪ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে ৪২ জন অংশগ্রহণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ জন আইনজ্ঞ, সমাজকর্মী, মানবাধিকারকর্মী, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৫ জুলাই শুক্রবার সকাল ১০টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্সের শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং কোর্স সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারওয়ার আলী এবং মফিদুল হক। কোর্সের রূপরেখা, কয়টি সেশন, অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে কোর্সটিতে ভালোভাবে তাদেরকে মানিয়ে নিতে পারবে, কীভাবে ক্লাস পারফর্মেন্স মূল্যায়ন এবং কীভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্-এর আইন বিষয়ক সহকারী অধ্যাপক ইমরান আজাদ। অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম অভিজ্ঞতা ছিলো ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ১টা ৩০ মিনিটে বাসযোগে অংশগ্রহণকারীরা জল্লাদখানা বধ্যভূমির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। সেখানে পৌঁছে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণকারীরা জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করে ১৯৭১

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মশালা : লেখালেখির খুঁটিনাটি

গল্প শুনতে ও বলতে আমরা সকলেই ভালোবাসি, কিন্তু লিখতে গেলেই আমরা বেশিরভাগ সময় বিপদে পড়ি। এ সমস্যা কাটানোর উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী কর্মশালা।

'কী লিখব, কীভাবে লিখব' এই থিমে আয়োজিত কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল জাদুঘরের কর্মীদের লেখালেখির দক্ষতা বৃদ্ধি করা। 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'য় নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের নানা গল্প, স্মৃতিকথা, ইতিহাস এবং জাদুঘরের কার্যক্রম নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই ভিন্নধর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। একই সাথে প্রতিবেদনের গঠনগত মৌলিক কৌশল সম্পর্কে জাদুঘরের

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

২ অক্টোবর বিশ্ব অহিংসা দিবসের আয়োজন : সম্প্রীতির বাংলা আমার

সংঘাত পীড়িত বর্তমান বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 'গড়ে তুলি শান্তির সংস্কৃতি' প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব অহিংসা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে গত ২ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে আলেখ্যানুষ্ঠান 'সম্প্রীতির বাংলা আমার'।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর বাণী পাঠ করেন তাবাসসুম নিগার ঐশী। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আবৃত্তিশিল্পী মাসুদুজ্জামান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা 'প্রশ্ন' ও মাহমুদা আখতার জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'সুচেতনা' এবং ফিলিস্তিনি কবি কামাল নাসেরের 'শেষ কবিতা'র আবৃত্তি পরিবেশন করেন রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সারি সারি সাদা-নীল পোশাকে মঞ্চে উঠে আসে বধ্যভূমির সন্তানদলের একঝাঁক শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণী। শুরু হয় আলেখ্যানুষ্ঠান 'সম্প্রীতির বাংলা আমার'। কাজী নজরুল ইসলামের গান 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' এবং কবিতা 'সাম্যবাদী'; সমবেত কণ্ঠে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি' গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও শ্যামল মিত্রের সুরের ঝলকে মুখরিত হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তন। তারপর নবীন-নবীনাদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মারুফুল ইসলামের কবিতা 'এ উগ্রবাদ আমার ধর্ম নয়'।

এরপর কচিকণ্ঠ একযোগে গেয়ে ওঠে আলী মহসিন রাজার কথা ও খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়ার সুরে 'ছোটদের বড়দের সকলের, আমারই দেশ সব মানুষের...'। শামসুর রাহমানের কবিতা 'পান্থজন' বৃন্দ-আবৃত্তির পর সমস্বরে গাওয়া কাজী নজরুল ইসলামের গান 'জয় হোক জয় হোক' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আলেখ্যানুষ্ঠান 'সম্প্রীতির বাংলা আমার'। আলেখ্যানুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম এবং জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠ-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রমিলা বিশ্বাস।

- শরীফ রেজা মাহমুদ

বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

"আজ আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসে আমরা স্মরণ করি মহাত্মা গান্ধির জন্ম দিনকে। সমতা, শ্রদ্ধা, শান্তি ও ন্যায়ের আদর্শকে পুনঃস্থাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করি। যে আদর্শের জন্যে মহাত্মা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আজকে আমাদের পৃথিবী সহিংসতায় পূর্ণ। বিশ্ব জুড়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রবল আঘাত অবিরাম চলছে। এখন প্রয়োজন সংঘাতের পেছনের অন্তর্নিহিত কারণগুলোর দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করা। যার অন্যতম হচ্ছে– বৈষম্য, দারিদ্র ও বিভক্তি। গান্ধি বিশ্বাস করতেন মানবতার সবচেয়ে বড় শক্তি অহিংসা। যেকোন অস্ত্রের চেয়ে এর ক্ষমতা বেশি। আসুন আমরা সবাই একসাথে এমন সমাজ গড়ে তুলি যা এই মহান লক্ষ অর্জনে সহায়ক হয়।"

– আন্তোনিও গুতেরেস

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে স্ক্যান/ক্লিক করুন

https://www.youtube.com/watch?v=Jv79x0ce5c0

গণহত্যা বিষয়ক ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্স

১ম পৃষ্ঠার পর

সালের মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি অনুধাবন করে। জল্লাদখানা বধ্যভূমির পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ইচ্ছে পোষণ করেন। জল্লাদখানা বধ্যভূমি তাদেরকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগের কথা স্মরণ করেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ, অপরাধের সামাজিক মাত্রা, আন্তর্জাতিক অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া, নুরেমবার্গ ও টকিও ট্রাইব্যুনালসহ এর সার্বিক অগ্রগতি, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, আইসিটি-বিডির মামলা বিশ্লেষণ, ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া এবং প্রমাণাদির ধরণ, বুদ্ধিজীবী হত্যা ও তাদের পরিবারের করুণ এবং বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, মানসিক ট্রমা সত্ত্বেও গণহত্যার শিকার হওয়া পরিবারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান ও অংশগ্রহণ, ফিলিস্তিনের গাজা গণহত্যা এবং জাতিসংঘ গণহত্যা কনভেনশন, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা, আইনি ইতিহাস এবং আশ্রয়প্রার্থী (রিফিউজি) বিষয়ক আইন, রোহিঙ্গা গণহত্যা এবং তাদের ন্যায়বিচার পাবার প্রক্রিয়া, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও আশ্রয় প্রার্থী সমস্যা আইনের মাধ্যমে গণহত্যার বিচার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে ১৫টি সেশন অনুষ্ঠিত হয় এই কোর্সে।

১৩তম সার্টিফিকেট কোর্সের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো ৩৫০০ শব্দের একটি লিখিত

অ্যাসাইনমেন্ট যা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ বিষয়ের ওপর লিখে জমা দিতে হয়েছে এবং এই লিখিত অ্যাসাইনমেন্টের জন্য 'সেরা গবেষক' পুরস্কার প্রদান করা হয়। কোর্স শেষে একটি লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর উক্ত কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যায়। এই পরীক্ষার নাম্বার এবং ক্লাস পারফর্মেন্সের ওপর ভিত্তি করে 'সেরা পারফর্মার' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন 'বাংলাদেশের বন্ধু'-খ্যাত জুলিয়ান ফ্রান্সিস। যিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশী রিফিউজিদের দুর্গতি মোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখেন এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের নিঃস্বার্থ সেবা করে যাচ্ছেন। তার কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে জুলিয়ান ফ্রান্সিস মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার অভিজ্ঞতা কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দুইজন এবং দ্বাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন অংশগ্রহণকারী তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারা বলেন এই কোর্স ছিলো গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার নিয়ে সমৃদ্ধ জ্ঞানের একটি উৎস; যেখান থেকে তারা গণহত্যা, আন্তর্জাতিক আইনের খুঁটিনাটি, বিভিন্ন গণহত্যা কনভেনশন এবং আইনের ব্যাখ্যামূলক সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান পেয়েছে। যা তাদেরকে উৎসাহিত করবে ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করতে, যেই গবেষণাগুলো বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সনদ প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় গণহত্যা এবং ন্যায়বিচারের ওপর অনুষ্ঠিত ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্স।

আরাফাত রহমান
ভলান্টিয়ার, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

গণহত্যার ইতিহাসে জ্ঞানযাত্রা

আমরা অনেকেই জানি মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ 'জেনোসাইড'-এর কথা। কিন্তু আমরা ক'জন জানি, পরিবেশের বিরুদ্ধেও 'জেনসাইড' হতে পারে? কিংবা কেমন আছেন গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মানুষেরা? এমন বহুমুখী কৌতূহল অবসান করতেই অনুষ্ঠিত হয় 'জেনোসাইড এবং জাস্টিস' শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্স।

গত পাঁচ জুলাই থেকে বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) কর্তৃক আয়োজিত 'গণহত্যা ও ন্যায়বিচার' শীর্ষক ত্রয়োদশ সার্টিফিকেট কোর্সটি ছিল আমার জীবনের এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এই কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া কেবল একাডেমিকভাবে নয়, ব্যক্তিগত ও নৈতিক দিক থেকেও আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। একজন আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থী হিসেবে, গণহত্যার ইতিহাস, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে এই জ্ঞানগত সংযোগ আমার জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোর্সের প্রতিটি সেশন গভীর আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিশেষজ্ঞ বক্তারা যে তাত্ত্বিক ও বাস্তবমুখী ধারণা তুলে ধরেছেন তা আমাকে ভাবতে এবং নতুন করে বুঝতে সহায়তা করেছে। এই কোর্সে অংশগ্রহণের আগে আমি গণহত্যা বিষয়ক যে সীমিত ধারণা পোষণ করতাম, তা প্রতিটি সেশনের সাথে নতুন আলোচনার মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে। গণহত্যার সংজ্ঞা, আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি এবং বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমি উপলব্ধি করি যে মানবাধিকারের এই গুরুতর লঙ্ঘন কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখনো আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব বিদ্যমান।

একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে, আমি শুধু তথ্য আহরণ করিনি, বরং সমমনা মানুষদের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি। বিভিন্ন গ্রুপ আলোচনার সময় আমরা গণহত্যা প্রতিরোধ, এর কারণ এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। গ্রুপে বিভিন্ন পেশার এবং শিক্ষার স্তরের অংশগ্রহণকারীরা থাকায় প্রতিটি আলোচনাই ছিল নান্দনিক এবং গভীর। একজন গবেষক হিসেবে এটি আমার জন্য বিশেষ সুযোগ ছিল, কারণ আমি শুধু নিজস্ব গবেষণাকর্মের উপর ভিত্তি করে মতামত দিয়েছি তা নয়, বরং অন্যদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকেও শিখেছি।

কোর্সের প্রতিটি অধ্যায়ে ছিল বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণীয় উপকরণ, যেমন প্রামাণ্যচিত্র, ঐতিহাসিক দলিল, গবেষণাপত্র এবং আদালতের রায়। এসব উপকরণের সাহচর্যে এসে আমি বুঝতে পারলাম কীভাবে ইতিহাসের একেকটি ঘটনা কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটেই নয়, বৈশ্বিক প্রভাবেও মূল্যায়িত হয়। উদাহরণস্বরূপ রুয়ান্ডা, বসনিয়া এবং দারফুর গণহত্যা বিষয়ক সেশনে আমি লক্ষ্য করেছি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং কোথায় সফলতা বা ব্যর্থতা রয়েছে। এসব ঘটনার সাথে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপট মিলিয়ে দেখা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং এবং শিক্ষণীয় ছিল। পাশাপাশি জেনেছি পরিবেশের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধ 'ইকোসাইড' সম্পর্কে। একাত্তরের গণহত্যায় শহিদ মুনীর চৌধুরী এবং জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পরিবারের সদস্য আসিফ মুনীর এবং মেঘনা গুহঠাকুরতার সেশনে শুনেছি কীভাবে ব্যক্তিগত শোক সামষ্টিক শোকে রূপান্তরিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে অবদান রাখছে। ইমরান আজাদ, আর্ল উৎপল অর্ক আদিত্য এবং মাননীয় বিচারক ফওজুল আজিম-এর অনবদ্য সেশনে জেনেছি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে গণহত্যা, জেনোসাইডের রূপায়ন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারকাঠামো। সামিনা লুৎফার সেশনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জেনেছি গণহত্যা ও জেনোসাইডের সামাজিক পটভূমি।

সার্টিফিকেট কোর্সে আমার গবেষণার বিষয় ছিল '১৯৭১ সালে সাঁওতাল এবং ওঁরাও সম্প্রদায়ের ওপর সংঘটিত গণহত্যা: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের বিশ্লেষণ'। এই গবেষণায় আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন এবং রোম স্ট্যাটিউটের আলোকেও মূল্যায়ন করেছি। গবেষণার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, সাঁওতাল এবং ওঁরাও সম্প্রদায়ের ওপর যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল, তা কোনোভাবেই সাধারণ অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি জাতিগত পরিচয় ধ্বংস করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছিল।

এই গবেষণা করতে গিয়ে, আমি বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বিশ্লেষণ করেছি। গবেষণার প্রাথমিক ধাপে আমি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, যাঁরা গণহত্যা নিয়ে কাজ করছেন। এ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাকে গবেষণার কাঠামো গড়তে সাহায্য করেছে। গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল: আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতা কি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি আন্তর্জাতিক আদালতের রায়, বিশেষ করে আইসিটিওয়াই এবং আইসিটিআর-এর রায় বিশ্লেষণ করেছি।

গবেষণার ফলাফল হিসাবে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সাঁওতাল এবং ওঁরাও জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত সহিংসতা সত্যিই গণহত্যার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, যখন একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর নৃশংসতা চালানো হয়, তখন তা গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই গবেষণাটি করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত এই গণহত্যার বিচার এখনো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি এবং বিচারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় এখনও অনেক দূর এগোতে হবে।

কোর্সটির সমাপনী দিনে, যখন আমাকে Best Researcher হিসেবে পুরস্কৃত করা হয় তখন এটি আমার জন্য এক অসাধারণ সম্মানের মুহূর্ত ছিল। এই স্বীকৃতি আমার কঠোর পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার প্রতি আগ্রহকে আরও দৃঢ় করেছে। গবেষণা কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং এক গভীর বোধের স্থান থেকেও উঠে আসে- এই উপলব্ধি আমি এই কোর্সের মাধ্যমে অর্জন করেছি।

কোর্সের সমাপ্তি ঘটলেও এর প্রভাব আমার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই কোর্সের মাধ্যমে আমি কেবল গণহত্যা এবং বিচার বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করিনি বরং মানবতার প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতা অনুভব করেছি। কোর্সের প্রতিটি মুহূর্ত আমার চিন্তাভাবনার ভিত্তি বদলে দিয়েছে এবং একজন গবেষক হিসেবে আমাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

তাসফিয়া তারান্নুম প্রভা
রিসার্চ ফেলো, সিএসজিজে

অনুপ্রাণিত পাঠ্যক্রম

অতীত থেকে শিক্ষা, ভবিষ্যৎ গঠন

কিছু অভিজ্ঞতা যতই সুন্দরভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করি না কেন, সেগুলো পুরোপুরি বোঝানো যায় না, যদি নিজে সেগুলো না অনুভব করা হয়। আমার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)’ আয়োজিত জেনোসাইড ও বিচার বিষয়ক ১৩তম সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ এমনই একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

কোর্সটিতে সীমিত আসন থাকার কারণে আমি আবেদন করতে খুব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, কারণ আমি তখন মাত্র স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করা একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ভেবেছিলাম আমি হয়তো সুযোগ পাব না। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো শুধু যে আমি এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি তাই নয় বরং আমি শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছি। শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাঠদান ছাড়াও আমি মনে করি, এই কোর্সের সবচেয়ে বড় দিক ছিল নানা বিষয়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কূটনীতিক এবং পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ। তাই প্রশ্নোত্তর সেশন বা অন্যান্য ইন্টারেক্টিভ ফরম্যাটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পেরেছে। এছাড়াও অন্য অংশগ্রহণকারী বা প্রশিক্ষকদের সাথে কখনও কখনও ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও সবাই একসঙ্গে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করার সময় অন্যদের বিরোধী মতামতের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, তা আমাদেরকে আরও সহনশীল হতে শেখায়, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি সবসময় জ্ঞান অন্বেষণে সচেষ্ট থাকি। তাই এই কোর্স থেকে যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। জেনোসাইডের জটিলতাগুলোতে আইনগত, সমাজতাত্ত্বিক, নৃবৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে গভীরভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে সত্যিই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এছাড়াও বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার জটিল আইনি কাঠামো ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। তত্ত্বগত-জ্ঞানের বাইরেও কিছু প্রশিক্ষকের যুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যে কোনো মানুষকেই গভীরভাবে নাড়া দিতে বাধ্য। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলো তাদের পরিবারের করা ত্যাগগুলো সত্যিকার অর্থে বুঝতে সহায়তা করে।

প্রাথমিকভাবে এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন এবং এই বিষয়ে আমার গভীর আগ্রহও রয়েছে। তবে জেনোসাইড বিষয়টি নিয়ে গভীরে যেতে যেতে অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছি বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস অর্জনে অবদান রাখতে। তাই যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়ে এই কোর্স শুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।

পরিশেষে আমি আয়োজকসহ অংশগ্রহণকারী এবং সম্মানিত প্রশিক্ষকদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যারা এই কোর্সের পুরো সময় ধরে এমন বৈচিত্র্যময় একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করেছেন। আমি আনন্দিত এবং গর্বিত, বলতে পারি যে আমি খালি হাতে ফিরে আসিনি, বরং অসংখ্য স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যা আমি সারা জীবন ধরে লালন করব।

মাহিয়া রহমান

স্কুল অব ল (এলএল.বি. অনার্স), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশিক্ষণ কর্মশালা : লেখালেখির খুঁটিনাটি

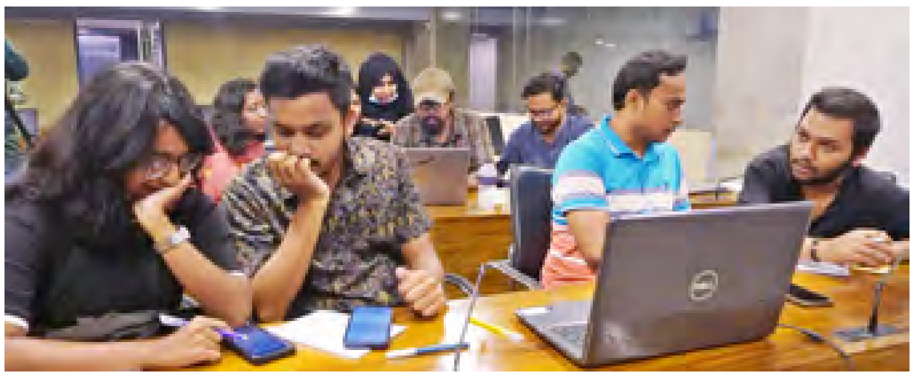

১ম পৃষ্ঠার পর

কর্মীদের মাঝে পাঠ দান করা হয়।

কর্মশালার সূচনা করেন স্বনামধন্য লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক, প্রশিক্ষক কুররাতুল আইন তাহমিনা। ‘কী লিখব, কীভাবে লিখব’ শীর্ষক এই প্রশিক্ষণে লেখালেখির নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পাঠদান শেষে সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘লেখা হলো চিন্তার প্রতিফলন। লেখার জন্য প্রথমে আমাদের ভাবনাকে স্পষ্ট করতে হবে।’ তাহমিনা গল্প এবং প্রতিবেদন লেখার সময় তথ্যের সত্যতা এবং পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য সঠিক উপস্থাপন পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান কীভাবে একটি লেখা পাঠকের মনে জায়গা করে নিতে পারে।

কর্মশালার দ্বিতীয় অংশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার প্রতিবেদনের বিভিন্ন ধরনের গঠন ও তথ্য উপস্থাপনার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। কিছু সংশ্লিষ্ট বই পড়ার পরামর্শ দেন এবং মজার কিছু খেলার মাধ্যমে প্রতিবেদনের নিয়ম শেখান। তাঁর সৃজনশীল পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে লেখার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরি করে। তিনি প্রতিবেদন তৈরিতে ভাষা ও ব্যাকরণের সচেনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালার তৃতীয় ও সমাপনী অংশে রফিকুল ইসলাম লেখার প্রয়োগিক দিক ও তা সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ভাষারীতি, বাংলা বানানের নিয়ম ও যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক পাঠদান করেন। তার আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের ভাষার ব্যবহার নিয়ে আরো সচেতন করে তোলে। একই সাথে তিনি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে শব্দ, সমার্থক শব্দ, প্রতিশব্দের ব্যবহার এবং বাক্য গঠনে শব্দের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করেন। রচনার বক্তব্য স্পষ্টকরণে যতি চিহ্নের ব্যবহারের ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা ধরনের প্রায়োগিক সমস্যার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারা সংবাদ প্রতিবেদন, গল্প নির্ভর প্রতিবেদনসহ দাপ্তরিক প্রতিবেদন, সভা প্রতিবেদন, দালিলিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারেন। প্রশিক্ষকগণ হাতে-কলমে কাজ করিয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে লেখার প্রতি উৎসাহিত করেন। এ ছাড়াও লেখার বিশেষ অনুশীলনও করা হয়; তারা দলগতভাবে একটি বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন লেখার চেষ্টা করেন এবং তা উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষকরা প্রতিটি উপস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং লেখার গুণগত মান উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী ও স্বেচ্ছাকর্মীরা লেখালেখির প্রতি আরো উৎসাহী হয়ে উঠতে সমর্থ হয় এবং লেখার নানা কৌশল সম্পর্কে নতুন জ্ঞান অর্জন করে যা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা লেখালেখির প্রতি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে এমন কার্যকর কর্মশালার মাধ্যমে কর্মীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা এধরনে কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে সপ্তাহব্যাপী একটি কর্মসূচি নেয়ার তাগাদা অনুভব করে।

তাহুয়া লাভিব তুরা

স্বেচ্ছকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

একজন যুদ্ধবন্দী ইকবাল আহমেদ

রবীন্দ্র ও গণসংগীত শিল্পী ইকবাল আহমেদ। ষাটের দশকের একজন মুক্তিসংগ্রামী সংস্কৃতিকর্মী। সক্রিয় ছিলেন– ছায়ানট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের কর্মকাণ্ডে। ডাকসুর নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক। '৭১-এর মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের হয়ে রাজপথে গান গেয়েছেন হারমোনিয়াম কাঁধে নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মে মাসে ধরা পড়েন পাকবাহিনীর হাতে। ১৬ ডিসেম্বরের পর বন্দীশিবির থেকে বেঁচে ফিরেছেন গণহত্যার দুর্বিষহ স্মৃতি নিয়ে। ১২ অক্টোবর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে উঠে আসে এই স্মৃতিকথা

২৫ মার্চ কালরাতে আমি বাসায়ই ছিলাম। তারপর বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে একটা বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিছুদিন পরে আবার ঢাকা শহরে ফিরে এলাম। মে মাসের এক গভীর রাতে পাকহানাদার বাহিনী আমাদের বাসা ঘেরাও করে। আর্মির গাড়িতে চাচা, ভাই ও আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টেমেন্টের ভিতরে কোন এক জায়গায়। একজন আর্মি অফিসার আমার সম্পর্কে তার সহকর্মীর সাথে মন্তব্য করলো– বোধ হয় কমিউনিস্ট। আমি বুঝতে পারলাম এমনি এমনি ধরে নিয়ে আসা হয়নি। পরের দিন সকালে ঢাকা কলেজের ভিতরে আমাদের স্থানান্তর করা হলো। তারপর দিন সকালে আমাদেরকে কোন এক ফ্যাক্টরিতে অবস্থিত ওদের একটা ক্যাম্পে নিয়ে গেলো। ফ্যাক্টরির গেটে ঢোকার সময় ভাই ও চাচাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলো। খুব নাটকীয়ভাবে আমাকে কয়েকজন সশস্ত্র সিপাহি ভিতরে নিয়ে গিয়ে একজন অফিসারের সম্মুখে রিপোর্ট করা হলো। আধা ঘণ্টার মতো একটা বন্ধ কামরায় রেখে নিয়ে যাওয়া হলো আবার ক্যান্টনমেন্টে। এখানকার বন্দীশালায় ঢোকার পর একজন নির্যাতনের ফলে অপ্রকৃতস্থ বন্দী আমাকে সেলুট দিলো। একজন সিপাহি তার কাছে জিজ্ঞস করলো আমার নাম কী? সে উত্তর দিল– খুনে জল্লাদ। আমি পাগল ছেলেটির মুখে নিজের এ ধরনের একটি নাম শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এরপর আমাকে একজন ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাবাদ করলো। তার প্রথম প্রশ্নই ছিল– হু ইজ ওয়াহিদুল হক? আমি বুঝলাম সব জেনেশুনেই ধরে আনা হয়েছে। ছাত্র জীবনে কোথায় কী করেছি সবই জানে তারা। পরে আমাকে একটা জায়গায় বসিয়ে বলা হলো এখানে তুমি একটা একটা করে ঘাস ছিঁড়তে থাকো। পাশে দেখছি আরও একজন ভদ্রলোক একইভাবে ঘাস ছিঁড়ছেন। তার হাতে বেশ জখমের দাগ দেখতে পেয়ে আমি ভয়ে দ্রুত ঘাস ছেঁড়া শুরু করলাম। পরে জানলাম ওনাকে তিন দিন ধরে পানি না দিয়ে এভাবে রাখা হয়েছে। একটা সময় পর একটা টয়লেট মতো জায়গা থেকে বদনা দিয়ে পানি এনে দু'জন সিপাহি সেই ভদ্রলোককে চন্দ্রবন্দ্র বলে ডেকে কাছে নিলো। উনি পানির জন্য বসে দু'হাত পেতে রইলেন। কিন্তু সিপাহিগুলো ওনার হাতে পানি না দিয়ে আশেপাশে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলো খেলার ছলে।

পাঁচ দিন পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রিজনার অব ওয়ার (যুদ্ধবন্দী) ক্যাম্পে। অত্যাচারের জন্য রিসেপশন কমিটি নামে একটা বিষয় ছিল সেখানে। নতুন যারা আসে তারা ঘন্টাখানেক পরে সেখান থেকে বের হওয়ার সময় হেঁটে বের হতে পারে না। রাতে কারো পক্ষে মাটির বিছানায় চিৎ হয়ে শোয়া সম্ভব হয় না। একেক জনের শরীরের পেছনটা বেগুন পোড়ার মতো ঠোসা পড়ে থাকে। এরপর ক্ষত শুকানোর পর ফটোসেশনের পালা। একটা নাম্বার প্লেট হাতে নিয়ে ফ্রন্ট সাইড ভিউ, পরে সাইড ভিউর ছবি তোলা হচ্ছিল। চন্দ্রবন্দ্র বলে আখ্যায়িত লোকটিকে যখন নাম্বার প্লেট তুলতে বলা হলো, তিনি তুলতে শক্তি পাচ্ছিলেন না। তারপর তাকে এতোটা জোরে পেছন থেকে লাঠির বাড়ি দেয়া হলো যে তিনি নাম্বার প্লেটটি কোন রকমে তুললেন। কিন্তু তার দু'হাত বেয়ে পুঁজ পড়তে লাগলো। পাকবাহিনী সর্বক্ষণ বন্দীদের সাথে নানা ধরনের বিকৃত তামাশা করতে পছন্দ করতো। পাকিস্তানিদের দ্বারা চন্দ্রবন্দ্র নামে ডাকা একজন ব্যক্তির কথা এখানে অল্প করে উল্লেখ করলাম মাত্র। এধরনের কতো ঘটনা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না।

ক্যান্টনমেন্টের বন্দীশিবিরে একটা ছেলে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বন্দী ছিল। তো অনেক দিন পর একজন ডাক্তার হয়তো এসেছে। ছেলেটা ডাক্তারকে তার গুলি লাগার জায়গাটি হয়তো দেখিয়েছে। পরক্ষণেই দেখা গেলো একজন আর্মি সেই গুলি লাগা জায়গায় তাকে বন্দুকের বাট দিয়ে পেটাচ্ছে। আমাদের তো অনেক কায়িক পরিশ্রম করানো হতো, ওই শারিরিক অবস্থাতেই হয়তো ছেলেটাকে সব কায়িক শ্রম করানো হচ্ছে। সেখানে কী ধরনের খাবার আমাদের দেয়া হতো সেই দুর্বিষহ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান শেরেবাংলা নগরের কোন একটা জায়গায় ছিল ওদের ফিল্ড ইন্টারগেশন সেন্টার। ফিল্ড ইন্টারগেশন সেন্টারে অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। যেমন ঘুমাতে না দেওয়া, ঘুরন্ত পাখার দিকে অপলক তাকিয়ে রাখা, পেটে বেয়োনেট ঢুকিয়ে ওপরের দিকে টান দিয়ে তুলে ডান দিকে ঘুরিয়ে হার্ট বিদীর্ণ করা। এক ধরনের ক্লিনিক্যালি নির্যাতন করা হতো। পেটাতে পেটাতে একটা সময় আসে যখন বন্দী মারা যাবে, ঠিক সেই সময় পেটানো থামানো হতো। আমি বলে বোঝাতে পারবো না এসব। ওখানে পাঁচ-সাত দিন রেখে আবার প্রিজনার অব ওয়ার ক্যাম্পে পাঠানো হতো। ক্যান্টনমেন্টে আমাদেরকে একটা গুদাম মতো ঘরে কাঁটাতার ঘেরা জায়গায় মেঝেতে ঘুমাতে দেয়া হতো রাতে। কিন্তু নভেম্বর নাগাদ যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ার দরুন গোলাবারুদ রাখার জন্য গুদামঘরটির দরকার পড়লে আমাদেরকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হলো। যেহেতু এটি একটি সিভিলিয়ান জেল তাই আমরা একে অপরের সাথে কথোপোকথনের সাহস পেলাম।

এতো মাস পরে এসে আমি জানতে পারলাম পাকবাহিনী কর্তৃক উল্লেখিত চন্দ্রবন্দ্র খ্যাত লোকটির নাম প্রাণেশ সমাদ্দার। যিনি একাধারে একজন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। তিনি পার্টির প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে জেনেছি তিনি একজন ভাষা সৈনিক ও ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সেন্ট্রাল জেলে যদিও আমাদের সাধারণ কয়েদিদের সাথে মিশতে দেয়া হতো না, জেলের ভিতরেই আরেকটি জেলে থাকতাম আমরা। তবুও আমরা এখানে এসে একটু মুক্ত পরিবেশ পেলাম যেন। আমাদের দায়িত্বে থাকতো ভয়াবহ অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা। ক্যান্টনমেন্টের সকাল-বিকাল নির্যাতনের হাত থেকে তো রেহাই পেলাম। এখানকার খাবারের অবস্থা খুবই নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও একটু ভাত-ডাল খেতে পেরে আমরা যুদ্ধবন্দীরা কিছুটা তৃপ্তি পেতে শুরু করলাম। জেল সুবেদার আমাদের শারীরিক অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েদিদের বলতো এই ভুখাদের একটু ভালো করে খেতে দেয়া হয় যেন। আমরা বুঝতাম না কেন আমাদেরকে ভুখা বলা হচ্ছে। দু'সপ্তাহ পরে ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরেকটা ব্যাচের যুদ্ধবন্দী স্থানান্তর করার পর আমরা বুঝতে সক্ষম হলাম, আমাদের ভুখা বলার কারণ। মাথায় চুল ন্যাড়া এক একটা কঙ্কালসার মানুষ। সেন্ট্রাল জেলে ঢোকানোর সময় কিছু নিয়ম আছে যেমন- ওজন মাপা, শারীরিক ক্ষত আছে কিনা পরীক্ষা করে প্রত্যেক কয়েদির একটা কার্ড তৈরি করা। স্বাধীনতার পর আমি আমার জেল-কার্ডটি কৌতূহলবশত সংগ্রহ করে দেখেছিলাম– আমার ছাব্বিশ পাউন্ড ওজন কমেছিল। এসব ঘটনা আমি কখনও কাউকে বলি না, কারণ আমি তো বেঁচে ফিরে আসছি কিন্তু কতো মানুষ ওখানে মারা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অন্যদের তুলনায় আমার কষ্ট খুবই নগণ্য।

একাত্তরের যুদ্ধবন্দী জীবনের যে ক্ষুদ্র বর্ণনা আমি করছি তাকে একশ দিয়ে গুণ করলেও প্রকৃত নির্যাতনের চিত্র আমার পক্ষে বলে বোঝানো সম্ভব হবে না। ডিসেম্বর মাসের কথা, আমরা তো বাইরের দুনিয়ার কোন খবর পাই না। একদিন দেখতে পেলাম জেলের ছোট্ট আকাশের ওপর খুব নিচু দিয়ে যুদ্ধ বিমান উড়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই বোমা পড়বার বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। পাকহানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে জেলার সাহেব এসে আমাদের জানালেন। আমি আনন্দে 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে উঠি, সাথে সাথে অন্য কয়েদিরা আমার শেখানো একটা গণসংগীত গাইতে শুরু করে। পর দিন ১৭ ডিসেম্বর আমাদের যুদ্ধবন্দী দশা থেকে মুক্তি হলো। অন্যান্য সাধারণ কয়েদিদের সাথে তখন আমরা দেখা করতে পারলাম। এরমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা একটা গ্রুপ এসে আমাদের চূড়ান্তভাবে মুক্ত করে নিয়ে গেলো। মে মাসে ঘুমন্ত অবস্থায় যে পোশাকে আমি আটক হয়েছিলাম সে পোশাকেই জেল থেকে বের হই। সেন্ট্রাল জেলে ঢোকার আগ পর্যন্ত ক্যান্টমেন্টের পাঁচ-ছয় মাস একই কাপড়ে ছিলাম। মজার বিষয় হলো, মুক্তিবাহিনীরা জেলে ঢোকার পর আমাদের ডেপুটি জেলারকে দেখলাম কয়েদিদের সাদা-কালো ডোরাকাটা পোশাক পরে সবার মাঝে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো জেল থেকে ছাড়া পেলাম। বাড়িতে বাবা-মা কারও থাকার কথা না। বাবা-মাও জানে না আমি বেঁচে আছি কিনা। এসব ভেবে আমি রিকশা করে জেলখানার পাশেই সংগীত শিল্পী শাহিন সামাদের বাড়িতে গেলাম। আমার কাছে তো কোন টাকাপয়সা নেই। আমি রিকশা থেকে নেমে বললাম, আমি আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে টাকা এনে আপনাকে দিচ্ছি– একটু অপেক্ষা করুন। রিকশাওয়ালা আমাকে বললো, স্যার আপনার কাছ থেকে পয়সা নিমু! কী কন! পয়সা লাগবো না আপ্নে যান। এই কথা আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

সংকলন : শরীফ রেজা মাহমুদ

ভুলি নাই শহিদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

ডা. আতিকুর রহমান

ডা. আতিকুর রহমানকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পাকহানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় এবং তিনি আর ফিরে আসেন নি।
ডা. আতিকুর রহমানের ব্যবহৃত কোট ও টুপি।

দাতা: মিমি রহমান

নূরুল আলম মুহিত

নূরুল আলম মুহিত ১৯৭১ সালে একমাত্র অস্ত্র শিকার করার বন্দুক নিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। পরে শহিদ হন তিনি। নূরুল আলম মুহিতের ব্যবহৃত টুপি এবং বন্দুকের বাক্স।

দাতা : রাশেদা আলম

ডা. সুলায়মান খান

১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন ডা. সুলায়মান খান। ডাক্তারি পাশ করার পর টঙ্গী জুট মিলে চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পিতৃগৃহে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে লিপ্ত হন। ২৫ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসররা তাঁর বাসার দরজা ভেঙ্গে তাঁকে শনাক্ত করে সরাসরি গুলি চালায়। আহত ডা. সুলেমান খানকে চাঁদপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে ২৬ এপ্রিল ভোরবেলা তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
শহিদ ডা. সুলায়মান খান-এর ব্যবহৃত সামগ্রী।

দাতা: শামসুন্নাহার স্বপন

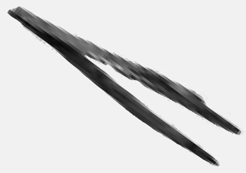

ডা. হাসিময় হাজরা

একাত্তরের ২৫মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। হাসিময় হাজরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত হন। তাঁর সদাহাস্য মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি নিজ নামের স্বার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন। পেশাগত জীবনেও ডা. হাসিময় হাজরা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান।
ডা. হাসিময় হাজরার স্টেথিস্কোপ ও তাঁর ব্যবহৃত শার্ট।

দাতা : কাজী তামান্না

১৯৭১ : নারী নির্যাতনের খণ্ডচিত্র

বাংলাদেশের কোনো এক জেলা শহরের কলেজ ছাত্রী। পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে উদ্ধারের পর তোলা এই ছবি অগণিত দুখিনী নারীর পীড়ন ও প্রত্যয় প্রকাশ করেছে।

আলোকচিত্রী : নাইবউদ্দিন আহমেদ

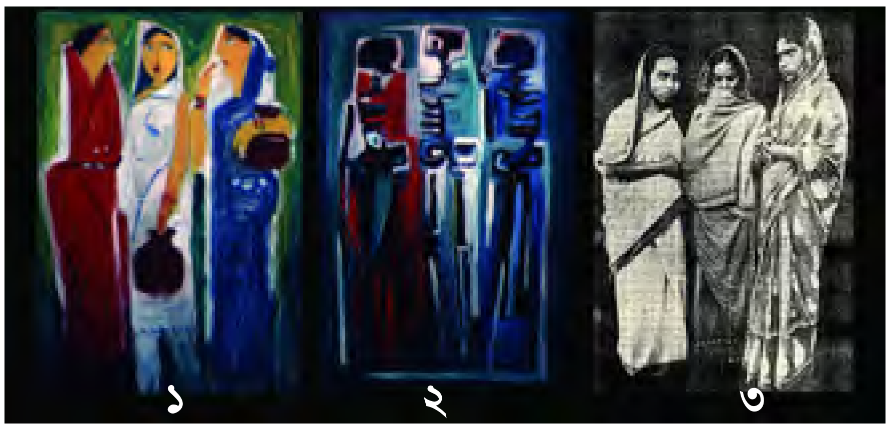

বাংলার তিন কন্যা

১. বাংলার চিরন্তন কাহিনী-নির্ভর কামরুল হাসানের চিত্রকলা ‘তিন কন্যা’
২. মুক্তিযুদ্ধকালে কামরুল হাসান অঙ্কিত ও প্রদর্শিত বাংলার নিগৃহীত ‘তিন কন্যা’
৩. পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত একাত্তরের ‘তিন কন্যা’

ছবি: ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার আর্কাইভ থেকে

বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা : ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ এবং বহুমাত্রিক ইতিহাসে নিজ গরিমায় জায়গা করে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'রোড মার্চার অফ ১৯৭১'। ফরিদ আহমেদ নির্মিত প্রামাণ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের জানান দেয় এবং একই সাথে সেই তাৎপর্যের পরবর্তী ধারাবাহক তরুণ প্রজন্মের সাথেও আমাদের পরিচয় ঘটায়।

'বিশ্ব বিবেক পদযাত্রা ১৯৭১' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিস্তৃত করেছে অন্য আঙ্গিকে। সশস্ত্র সংগ্রামের সমান্তরালে বাংলার মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে করা বহুমুখী কার্যক্রমের নিদর্শন হিসেবে তা বিবেচিত হয়। বাঙালিদের উপর পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘঠিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন বন্ধ, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ছিলো এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য।

'অখিল ভারত শান্তি সেনা মন্ডল'-এর সহযোগিতায় তৎকালীন বাংলাদেশের ১৯ জেলার ৩৮ জন তরুণ ১৪ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে দিল্লির উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করে।

'বিশ্ব বিবেক পদযাত্রা ১৯৭১'-এর ৩৯তম বার্ষিকীতে ৭১-এর যাত্রীদলের মিলনোৎসব হয় ১৫ অক্টোবর ২০১০ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে। মিলনোৎসবে যাত্রীদল তাদের যাত্রার অভিজ্ঞতা, কী রকম পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটে তাদের এই কর্মসূচি তা আলোকপাত করেন। মিলনোৎসবের এক পর্যায়ে একাত্তরের যাত্রীদল তাদের পদযাত্রার প্রতীক লাল সবুজের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা পতাকা হস্তান্তর করেন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।

'রোড মার্চার অফ ১৯৭১' স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে মফিদুল হক, মানজারে হাসীন মুরাদ, শামীম আখতার, রফিকুল ইসলাম, শবনম ফেরদৌসী, মো. আবসুদ সামাদ, জাভেদ হোসেইন, আমেনা খাতুন, রঞ্জন কুমার সিংহ, চন্দ্রজিৎ সিংহ, মামুন সিদ্দিকী এবং মিজানুর রহমান-এর অবদান অনস্বীকার্য।

এই প্রামাণ্যচিত্রে ব্যবহৃত স্থির চিত্রের স্বত্ব কে এম জাহাঙ্গীর আলমের। মৌসুমী ভৌমিক, দোহার এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে এই চিত্রে। প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাতা ফরিদ আহমেদ।

সতেরো মিনিট সতেরো সেকেন্ডের এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ইতিহাসকে তুলে ধরে স্মৃতিচারণ এবং ঘটনার রেকর্ডিং ফুটেজের সমন্বয়ে। প্রামাণ্যচিত্রটির শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান 'তোমার পতাকা যারে দাও' চিত্রটির মূলভাবকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রথম দৃশ্যেই আমরা স্বাধীন বাংলার পতাকা দেখতে পাই যা ৭১-এর পদযাত্রীদল বহন করে।

২০১০ সালে পদযাত্রী দলের মিলনোৎসবের পাশাপাশি আমরা কিছু একক সাক্ষাৎকার দেখতে পাই। তাদের আবেগ জানান দেয় দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং অহংকার। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। পদযাত্রী দলের এই যাত্রার পেছনে অনুপ্রেরণার কারণটিও আমরা এখান থেকে আন্দাজ করতে পারি।

প্রমাণ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রর শেষাংশে তরুণ প্রজন্মের হাতে সেই একই পতাকা দেখা যায়, তারা হেঁটে যাচ্ছে ১৯৭১ সালের পদযাত্রীদের পতাকা আকাশে তুলে তাদের অবদানকে সম্মান করে এবং তাদের আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে।

রুরুমুনি রায় মজুমদার
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রামাণ্যচিত্রটি দেখতে স্ক্যান/ক্লিক করুন
https://www.youtube.com/watch?v=Li_K-HFB8Bo

মন্তব্য খাতা থেকে

আমরা ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের শিক্ষার্থী। এখানে ঘুরে আমাদের অনেক ভালো লেগেছে। অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি, অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

অনন্যা সরকার
ইকবাল সিদ্দিকী কলেজ
০৫.১০.২০২৪

আজ আমার আরও চারজন সহকর্মীসহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে দেখলাম। অত্যন্ত গোছানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত অসংখ্য নিদর্শন, স্মৃতি এখানে আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান। এর পাশাপাশি একটি ডকুমেন্টারি/লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম বা অনুরূপ একটা ২০/৩০ মিনিটের শো-এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
আমি এই জাদুঘরের আরো সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

মো: মাসুদ সাদিক
কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট
আপিলাত ট্রাইব্যুনাল
আগারগাঁও, ঢাকা
০৩.১০.২০২৪

আমি কুষ্টিয়া থেকে এসেছি।
সত্যি বলতে মনে হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কিছুই বাকি রাখেনি, মনে হলো যেন আবার মুক্তিযুদ্ধে ফিরে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধ একটাবারের মতো ছুঁয়ে দেখলাম। বারবার কেন জানি মনে হচ্ছিল শিউরে শিউরে উঠছে আমার হৃৎপিণ্ড।

এযেন এক অন্যরকম অনুভূতি যা কি-না ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কেন জানি হুট করে মনে পড়ে গেল লাইনটি-
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মো: রিফাত হোসেন মনা
১০.০৯.২০২৪

এই জাদুঘর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার আগের ঔপনিবেশিক শাসন আমলকে ধারণ করে। আমাদের যোদ্ধাদের অবদান আমরা কখনো ভুলবো না।
দেশকে ভালোবাসি এবং দেশের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।
আমরা বাঙালি হিসেবে গর্বিত।

নিলয় দাস
সুমন বিশ্বাস
হৃদয় মজুমদার
হরিনারায়ণ বিশ্বাস
নোয়াখালী
০৯.০৯.২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের দেখা উচিৎ। তাহলে সত্য ইতিহাস সবাই জানতে পারবে। আমরা আগেও এসেছি। আমার ছোট মেয়ে তখন ছোট ছিল। এবার এসে অনেক কিছু জানতে পেরেছে।

সুলতানা পারভীন
মঠবাড়ী সদর, যশোর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারে শোকের ছায়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীর শোক এবং বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের টিকেট কাউন্টার ইনচার্জ নাজমা সুলতানা গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হৃদযন্ত্রের ভাল্ব প্রতিস্থাপনের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নাজমা সুলতানা। তিনি দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সল্পভাষী, সদা-হাস্যোজ্বল, দায়িত্বশীল এই কর্মীর অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাথে জাদুঘর সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।

প্রয়াত সহযাত্রী নাজমা সুলতানা

সামাজিক প্রাণি হিসেবে জন্মসূত্রে রক্তের সম্পর্কের বন্ধনে যেমন আমরা আবদ্ধ থাকি, তেমনই নিত্য চলার পথে এমন অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হই যারা ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তেমনই একজন মানুষ ছিলেন নাজমা আপা, আমার কর্মজীবনের এক বিশ্বস্ত সাথী। তিনি শুরু থেকে আমার কেবল একজন সহকর্মীই নন বরং ছিলেন একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, বড়বোন, অনেক বেশি আপন, আত্মার আত্মীয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কখনোই আমাদের জন্য নিছক কাজের জায়গা বা একটি অফিস না বরং এখানে আমরা সবাই মিলে একটি পরিবার। এই পরিবারের সবার সাথে ছিলো নাজমা আপার সুসম্পর্ক। এক টুকরো মন ভোলানো হাসি দিয়ে মুগ্ধ করতেন সবাইকে। শান্ত স্বভাব, বেশিরভাগ সময় থাকতেন চুপচাপ। কোন সমস্যার মুখোমুখি হলেই তিনি এসে দাঁড়াতেন পাশে। ব্যক্তিগত পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করতেন। আমাদের একসাথে কাটানোর সময়গুলো ছিলো অনেক সুন্দর। আমাদের সাথে সময় কাটাতে তিনি অনেক পছন্দ করতেন। আমরা শেয়ার করতাম ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের অনেক কথা। তিনি নিজের কাজকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি গুরুত্ব দিতেন পরিবারকে ও চিন্তা করতেন ভাইবোনদের নিয়ে। তিনি জানতেন কীভাবে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হয়। তার এই গুণাবলীর জন্যই তাকে এতো ভালোবাসতাম সম্মান করতাম। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যার জীবনে শত কষ্ট থাকার পরও উদ্বেগের ছাপ ছিলো না। তার মস্তিষ্ক ছিল শীতল আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী। প্রতি দিন দুপুরে খাবারের সময় দেখা করতে যেতাম টিকিট কাউন্টারে তার সাথে, তিনি অনেক খুশি হতেন। বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলতেন, তোমরা আমার সাথে দেখা করতে আস আমি অনেক খুশি হই, কারণ আমি তো তোমাদের সাথে দেখা করতে যেতে পারি না। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন দুঃখি মানুষ। জীবন সম্পর্কে ছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা, তারপরেও হার মানতে চাইতেন না জীবনের কাছে। আমি তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতাম। সেই সাহাসী মানুষটি যে এত সহজে মৃত্যুর কাছে হার মানবেন তা কখনো বুঝতে পারিনি। প্রায় সময় তিনি আমার জন্য অফিস শেষে দাঁড়িয়ে থাকতেন এক সাথে যাওয়ার জন্য। যদিও আমাদের দু'জনের রাস্তা দু'দিকে ছিল। তবুও মনে হতো যেটুকু রাস্তা এক সাথে যেতে পারি তাই যেন আমাদের অনেক বড় লাভ। অফিস বন্ধ থাকলেও একে অপরকে ফোন দিয়ে কথা বলতাম।
আবার অনেক সময় ফোন দিয়ে একসাথে বাসা থেকে বের হতাম। নাজমা আপার সাথে যাওয়ার সময় হঠাৎ হঠাৎ তিনি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে অথবা বসে পড়তেন। বলতেন আমার বুক ধড়ফড় করে, ব্যাথা হয়, হাঁটতে পারি না। তুমি চলে যাও। আমি তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। যদি আমার কোন তাড়া থাকতো, তাহলে তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে সাবধানে যাবেন বলে চলে যেতাম। সবসময় বলতাম ভালো করে ডাক্তার দেখান। তিনি বলতেন ডাক্তার আমাকে অপারেশন করতে বলেছেন। আমি অপারেশন করাতে ভয় পাই, তাছাড়া টাকা লাগবে অনেক। এত টাকা আমার কাছে নেই, টাকা হলে অপারেশন করাবো। দেখি কতদিন ওষুধ খেয়ে বাঁচতে পারি। তিনি ভয় পেতেন, যদি আমাদের আরেক সহকর্মী রনজিত দাদার মত হার্টের অপারেশন করতে গিয়ে আর ফিরে না আসি। তার ফিরে না আসার ভয়টাই সত্যি হয়ে গেল। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ তিনি আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তার হঠাৎ চলে যাওয়া আমাদের সকলের জন্য একটি বড় শূন্যতা তৈরি করেছে। কর্মক্ষেত্রের সেই চেনা মুখটি আর দেখতে পারবো না। কিন্তু তার কাজের প্রতি নিষ্ঠা সহযোগিতা আর বন্ধুত্বের স্মৃতিগুলো আমাদের মনে চিরকাল থেকে যাবে। তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন এক ব্যাতিক্রমী মানুষ। যার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত এখন স্মৃতি। আজ যখন তার কথা ভাবি তখন শুধু একজন সহকর্মী নয় বরং মনে হয় একজন সত্যিকারের আপনজন হারিয়েছি। আমরা চিরকাল আপনাকে মনো রাখবো। মৃত্যু আপনাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার সাথে কাটানো স্মৃতিগুলো আমাদের সাথে থেকে যাবে চিরদিন। প্রতিটি হাসিতে, প্রতিটি কঠিন সময়ের অনুপ্রেরণায়, সফলতায়, আনন্দে, স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দোয়া করি পরপারে অনেক অনেক ভালো থাকবেন।

মিতুয়া মমতাজ
গ্যালারি গাইড, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ দর্শনার্থীরা

বাংলাদেশ রাজস্ব বোর্ডের অ্যাপিলেট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ গত ৪ অক্টোবর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাশিয়া এবং স্তোনিয়া থেকে আগত দর্শনার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তারা মন্তব্য বইতে লেখেন–
Dear Bangladeshi friends!
It was a great pleasure that we visited the wonderful museum. Thank you very much for the friendly greetings to a international group of Estonian and Russian travelers.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official